

এপ্রোপ্রিয়েট টেকনোলজী : ধারণাগত মৌলিক অবকাঠামো

ডঃ এম, কামাল উদ্দিন *

Abstract : The multidisciplinary and multidimensional interactive effects of technology vary with respect to place and time. In the present world, technology is rendering its tremendous contribution to satisfy the needs and demands of society, and new technological innovation is generating new wealth and new social demands which in turn creating changes in various components of social surroundings causing evolutionary changes of the society. Incompatible technology renders negative effects in various fields such as socio-cultural, environmental, economics, politico-legal systems etc. Sometimes the negative effects of technology is such that it paves the way of povertization and in many cases it becomes directly threat to society, environment, economy, culture, health, political system, etc. Due to convergence of wide variety of concerns of developed and developing countries regarding the appropriateness of technological applications, the concept of appropriate technology evolved. In the present world, both the developing countries are in quest of appropriate technology. Technological appropriateness is not an intrinsic quality of any technology, but it is derived from the surroundings in which it is to be utilized and also from the objective functions used for evaluation. A fundamental conceptual setting of appropriate technology in the perspective of advanced technology, intermediate technology and low level technology has been presented in this paper. Technological appropriateness has been explained by introducing the concept of four basic orientations of appropriate technology. In the paper, a sectoral model has been presented which can be used as strategy for selecting appropriate technology.

১.০ ভূমিকা

গত শতাব্দীর তৃতীয় চতুর্থাংশ সময়ে বিশ্বের শিল্পোন্নত দেশগুলো এক অপ্রত্যাশিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছিল। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি বহুবিধ উন্নয়নমুখী প্রযুক্তির উদ্ভব ঘটেছিল যেগুলো ছিল একদিকে ঐ দেশগুলোর দ্রুত উন্নয়নের কারণ এবং অন্যদিকে উন্নয়নের ফলশ্রুতিতে প্রযুক্তিগুলোর উদ্ভাবন। এমনকি যেসব উন্নয়নশীল দেশসমূহ আমদানীকৃত

* পরিচালক ও সহযোগী অধ্যাপক, ইনস্টিটিউট অব এপ্রোপ্রিয়েট টেকনোলজি, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

প্রযুক্তির মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিল্পায়নের মডেল অনুকরণ শুরু করেছিল সে সমস্ত দেশও একই সময়ে প্রচুর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছিল। প্রকৃতপক্ষে, ষাটের দশকের ক্রান্তিলগ্নে মানব জাতির ভবিষ্যৎ যেমন ভাল প্রতীয়মান হয়েছিল-এমনটি আর কখনোই দৃশ্যমান হয় নাই। ১৯৭০ এর কাছাকাছি কোন এক সময়ে সমস্ত প্রত্যাশায় চিড় ধরতে শুরু করল এবং ১৯৭৩ এর তেল সংকটের মতো ঘটনা থেকে তখন এই বিষয়টি প্রতীয়মান হয় যে, গত দুই যুগের চলমানধারার ভিত্তি করে শুধুমাত্র অভিক্ষেপণ (trend extrapolation) এর মাধ্যমে নিরূপিত ভবিষ্যৎ ধারা প্রকৃত অবস্থা থেকে ভিন্নতর হবে। বলা যায় হঠাৎ করেই শিল্পোন্নত দেশগুলো অনুধাবন করতে শুরু করল যে তাদের কিছু বিশালকায় প্রযুক্তি মানব জাতির টিকে থাকার প্রশ্নে সরাসরি হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এদিকে উন্নয়নশীল দেশগুলো নিশ্চিতভাবে উপলব্ধি করল যে কিছু আমদানীকৃত প্রযুক্তি তাদেরকে দরিদ্রতর করে তুলছে এবং উন্নত দেশগুলোর প্রতি আরো বেশি নির্ভরশীল করে তুলছে। এ ভাবে সূচিত হল কিছু কিছু প্রযুক্তির ব্যবহার ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রযুক্তির 'উপযুক্ততা/যথার্থতা' (appropriateness of technology) সমক্ষে প্রশ্ন ও গভীর উদ্বেগ।

শিল্পোন্নত দেশগুলোতে এপ্রোপ্রিয়েট বা লাগসই প্রযুক্তি আন্দোলন (Appropriate Technology Movement) সূচিত হয়েছিল বহুবিধ উদ্বেগতার সমন্বিত কারণে। নিম্নোক্ত প্রয়োজনসমূহ উল্লেখযোগ্য :

- পরিবেশের সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ (harmonious) ও দীর্ঘস্থায়ী (sustainable) সম্পর্ক অনুসন্ধান ও প্রতিষ্ঠা
- ক্রমবর্ধমান জ্বালানি ও সম্পদ সংক্রান্ত সংকট নিরসনের উপায় চিহ্নিতকরণ।
- পরিবেশ বিপন্নকারী কার্যকলাপ হ্রাসকরণ (reduce alienating work)।
- বিদ্যমান সামাজিক মূল্যবোধের সহায়ক ও অনুকূল কর্মক্ষেত্রের বিকাশ ও অধিকমাত্রায় সম্প্রসারণ।
- দেশীয় মালিকানাধীন ও পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহের সংখ্যা বর্ধিতকরণ এবং স্থানীয় অর্থনীতি শক্তিশালীকরণ।
- ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে প্রচারিত ক্রমবর্ধমান অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও বন্ধ্য প্রকৃতির গণসংস্কৃতির প্রসার রোধকল্পে স্থানীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন।

উন্নত বিশ্বে লাগসই প্রযুক্তি আন্দোলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বস্তুতঃ চরম বস্তুবাদের মাধ্যমে একটি শিল্প সংস্কৃতি বাড়াবাড়ি ও ভারসাম্যহীনতা (excesses and imbalances) ও সংশোধন করার একটি প্রয়াস মাত্র। অপরপক্ষে, উন্নয়নশীল দেশগুলোতে লাগসই প্রযুক্তি বা এপ্রোপ্রিয়েট টেকনোলজীর আন্দোলন বিকাশ লাভ করেছে কতগুলো ভিন্ন প্রকার বিবিধ বিষয়ে উদ্বেগতার কারণে। সবচেয়ে সুস্পষ্ট কারণ এই যে, উন্নত দেশ থেকে গৃহীত ও অনুকরণকৃত শিল্পায়ন কৌশলগুলো উন্নয়নশীল দেশগুলো তাদের দারিদ্র ও অসমতা (poverty and inequalities) সম্পর্কিত সমস্যা সমাধানে সফলকাম হয়নি। এর জন্য বহুবিধ কারণ রয়েছে। বিশ্বের প্রযুক্তিগত সম্পদ যা শিল্পায়নের জন্য অপরিহার্য ভিত্তি, সেগুলো কঠোরভাবে পুঞ্জীভূত ও নিয়ন্ত্রিত হয় পৃথিবীর খুব স্বল্পসংখ্যক ও সবচেয়ে অগ্রসরমান উন্নত জাতির দ্বারা। উল্লিখিত প্রযুক্তিগত সম্পদ মূলতঃ উদ্ভব ও বিকশিত হয়ে আসছে ঐ সমস্ত উন্নত দেশগুলোর অর্থনীতি ও ফ্যাক্টর কস্ট (factor cost) ইত্যাদি উন্নয়নের জন্য এবং ভোক্তা নাগরিকদের জীবন পদ্ধতির উন্নতি বিধানের জন্য। এই দেশসমূহের বাণিজ্যিক স্বার্থ বা সুবিধাগুলো উন্নয়নশীল দেশগুলোর শিল্পায়ন প্রক্রিয়ায় একটি

বড় ফ্যাক্টর বা গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব হিসাবে কাজ করেছে। প্রযুক্তি হস্তান্তর শুধুমাত্র বিদেশী স্বার্থ বা সুবিধাগুলোকে সংরক্ষণ করেছে, তা মূলতঃ প্রাকৃতিক সম্পদ, সস্তা শ্রম ও উচ্চ শ্রেণীর ভোক্তাদের বাজার সংশ্লিষ্ট সুবিধা শোষণ করার জন্য। এর ফলে কোটি কোটি মানুষের দারিদ্রতার রূপ আধুনিকীকরণ হয়েছে। বহুক্ষেত্রে আমদানীকৃত প্রযুক্তির প্রচলন স্থানীয় সংস্কৃতিতে মৌলিক ও প্রচণ্ড আক্রমণ হিসাবে উদ্ভূত হয়েছে। সুতরাং উন্নয়নশীল দেশগুলোতে লাগসই প্রযুক্তি আন্দোলনের গুণগত বৈশিষ্ট্যাবলী হচ্ছে তাদের সামাজিক পারিপার্শ্বিকতার (social surroundings) উপযুক্ত এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও উপযোগীকরণের (adaptation) একটি প্রয়াস। যদিও উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে লাগসই প্রযুক্তির আন্দোলন পরম্পরের অভিমুখে অগ্রসরমান, তবুও লাগসই প্রযুক্তির যথার্থ ভূমিকা সম্পর্কে প্রচুর ভুল ধারণা এবং আশঙ্কা বা সংশয় বিদ্যমান। সেগুলোর কিছু কিছু অত্র প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

২.০ প্রযুক্তির যথার্থতা বা এপ্রোপ্রিয়েটনেস (Appropriateness) এর ধারণা

প্রযুক্তি হচ্ছে গবেষণা ও উন্নয়নমূলক ল্যাবরেটরী বা কারখানা (R&D factories) হতে উদ্ভাবিত পণ্য। বিভিন্ন গবেষণা ও উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান একই বা সমপ্রকার লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে। এর কারণ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা (surroundings) প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য একটি নিয়ন্ত্রক শক্তি (guiding force) হিসাবে কাজ করে, যেটা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন হয়, যদিও মানব সমাজের বিভিন্ন প্রয়োজনে উৎসারিত চালিকা শক্তি (driving force) একই হতে পারে এবং এই পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে আমাদের আশে-পাশের সব কিছুই পড়ে যেমন, জনসংখ্যা, সম্পদ, অর্থনীতি, প্রযুক্তি, পরিবেশ, সামাজিক-সাংস্কৃতিক (socio-cultural) এবং আইন-রাজনৈতিক (politico-legal) ধারা। উপরন্তু, প্রযুক্তি উন্নয়নের জন্য ব্যবহৃত উদ্দেশ্যমূলক নিয়ামক বা অবজেক্টিভ ফাংশন (objective function) বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন হতে পারে। অবজেক্টিভ ফাংশনের দুইটি মূল উপাদান হচ্ছে-সুযোগের সর্বোচ্চ ব্যবহার (maximization of opportunities) যা ধনাত্মক ফলোৎপাদক (positive effects) এবং ক্ষতির সর্বনিম্নকরণ (minimization of losses) যা ঋণাত্মক ফলোৎপাদক (negative effects)।

সুতরাং একটি প্রযুক্তি উদ্ভাবনের সময় যে পারিপার্শ্বিকতার জন্য এর উদ্ভাবন হয়েছে এবং যে অবজেক্টিভ ফাংশন ব্যবহার করে উদ্ভাবিত হয়েছে সে অনুযায়ী প্রযুক্তিটি ঐ স্থানে এপ্রোপ্রিয়েট হবে। প্রযুক্তি একই স্থানে ভিন্ন সময়ে এপ্রোপ্রিয়েট বা লাগসই হতে পারে বা নাও হতে পারে, কারণ পারিপার্শ্বিকতা এবং/অথবা অবজেক্টিভ ফাংশন পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে। একইভাবে, এটি বিভিন্ন স্থানে একই সময়ে বা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এপ্রোপ্রিয়েট হতে পারে নাও পারে, কারণ পারিপার্শ্বিকতা এবং অবজেক্টিভ ফাংশন সমপ্রকার থাকতে পারে বা পরিবর্তন হতে পারে। সুতরাং প্রযুক্তির যথার্থতা বা এপ্রোপ্রিয়েটনেস একটি প্রযুক্তির অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যগত কোন গুণ নয়। এটি ঐ স্থানের পারিপার্শ্বিকতা থেকে উদ্ভূত যেখানে এটি ব্যবহৃত হবে। তদুপরি প্রযুক্তির উদ্ভব ঘটে ঐ সমস্ত অবজেক্টিভ ফাংশন থেকেও যেগুলো প্রযুক্তির মূল্যায়নের জন্য ব্যবহৃত হবে। উপরন্তু, প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট সব কিছুর এক ধরনের মূল্যায়ন (value judgement)।

আমাদের সাধারণ ধারণাগত কাঠামো অনুযায়ী, যে কোন প্রযুক্তি এর প্রথম অবস্থায় প্রয়োগের সময় ও স্থানে এপ্রোপ্রিয়েট থাকে। এটি পরবর্তীতে কোন সময়ে এবং/অথবা ভিন্ন কোন স্থানেও এপ্রোপ্রিয়েট হবে যদি পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং সেই সাথে অবজেক্টিভ ফাংশনগুলো প্রাথমিক পর্যায়ে মত হয় (similar to the origin) এবং এটি পরবর্তী কোন সময়ে এবং/অথবা ভিন্ন কোন স্থানে এপ্রোপ্রিয়েট হবে না সাধারণতঃ তিনটি কারণে-

□ ভিন্ন বা পরিবর্তিত পারিপার্শ্বিকতা হলে;

- ভিন্ন বা পরিবর্তিত অবজেক্টিভ ফাংশন, হলে; এবং
- ভিন্ন বা পরিবর্তিত পারিপার্শ্বিকতা ও অবজেক্টিভ ফাংশন হলে।

এই বিষয়েগুলোকে কিছু উদাহরণ দিয়ে নিম্নে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কিন্তু প্রথমতঃ দেখতে হবে অবজেক্টিভ ফাংশন ও পারিপার্শ্বিকতা কিভাবে ভিন্ন বা পরিবর্তন হতে পারে।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে অবজেক্টিভ ফাংশনের দুটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। একটি হচ্ছে, অনুকূল বা পজিটিভ বৈশিষ্ট্যগুলোর সমষ্টিগত ফলের সর্বোচ্চকরণ এবং অন্য দিকটি হচ্ছে প্রতিকূল বা নেগেটিভ বৈশিষ্ট্যগুলোর সমষ্টিগত ফলের সর্বনিম্নকরণ। সুতরাং, তিনটি উপায় আছে যেগুলোর দ্বারা অবজেক্টিভ ফাংশন স্থান ও সময়ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে :-

- অনুকূল বা পজিটিভ বৈশিষ্ট্যর কোন ফ্যাক্টরগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- প্রতিকূল বা নেগেটিভ দিকগুলো কোন ফ্যাক্টরগুলো অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।
- উপরোক্ত দুই প্রকারের ফ্যাক্টরগুলোর মধ্যে কি ধরনের/কতটুকু আপেক্ষিক গুরুত্ব (relative weightage) দেয়া হয়েছে।

উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহের মধ্যে পারিপার্শ্বিকতার বিভিন্নতা বেশ উল্লেখযোগ্য এবং বিভিন্ন প্রকাশনায় ভালভাবে সন্নিবেশিত করা আছে (Tetiel, 1978)। এমনকি উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহের নিজেদের মধ্যেও পারিপার্শ্বিকতার ক্ষেত্রে প্রচুর ভিন্নতা বিদ্যমান। একটি প্রযুক্তিকে যে সমষ্টিগত পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে কাজ করতে হয়, তার প্রতিটি স্বতন্ত্র উপাদানগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে উপরোক্ত ভিন্নতাগুলোর উদ্ভব ঘটে। সামগ্রিক পারিপার্শ্বিকতাকে সহজেই সাতটি উপাদানে বিভক্ত করা যায় :

(১) জনসংখ্যার দিক; (২) সম্পদগত দিক; (৩) অর্থনৈতিক দিক; (৪) প্রযুক্তিগত দিক; (৫) পরিবেশগত দিক; (৬) সামাজিক-সাংস্কৃতিক (socio-cultural) দিক; এবং (৭) আইন-রাজনৈতিক (politico-legal) দিক। এই বৈশিষ্ট্যগুলোর প্রতিটির ক্ষেত্রে অসংখ্য বৈচিত্র্য বিদ্যমান। জনসংখ্যার পার্থক্য অবলোকন করা যায়, জনসংখ্যার ঘনত্ব ও ডেমোগ্রাফিক (demographic) কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে। সম্পদগত পার্থক্য সর্বত্র বিরাজমান। সমগ্র পৃথিবীর সম্পদ অনিয়মিতভাবে বিস্তৃত (unevenly distributed) আছে। দেশে দেশে এমনকি একটি দেশের অভ্যন্তরেও অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত অবস্থার ভিন্নতা প্রচণ্ডভাবে দৃশ্যমান হয় অতি দরিদ্র থেকে অতি ধনী পর্যন্ত। বস্তুগত পরিবেশ বিনষ্টের (degradation of physical environment) হারের পরিমাণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন মাত্রা বা প্রকারের হয়। সামাজিক-সাংস্কৃতিক নিয়ামকগুলোর বিভিন্নতা হয় ব্যাপকভাবে, সবচেয়ে প্রাচীন থেকে সবচেয়ে অগ্রসরমান পর্যন্ত (most primitive to most advanced)। এবং পৃথিবীতে বহু এবং বিভিন্ন রকমের আইন-রাজনৈতিক ধারা ও পদ্ধতি চালু আছে। অতএব দেখা যাচ্ছে, পারিপার্শ্বিকতার সাতটি উপাদানের প্রতিটিই ব্যাপকভাবে ক্ষেত্র বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন হয়।

পারিপার্শ্বিকতা ভিন্ন হয় শুধুমাত্র স্থানভেদে নয়, সময়ভেদেও। প্রকৃতপক্ষে, সময় প্রবাহ ও প্রযুক্তির প্রয়োগের সাথে সাথে পারিপার্শ্বিকতার প্রায় সমস্ত উপাদানই পরিবর্তিত হয়, হয়তো ভালোর জন্য অথবা খারাপের জন্য। কিন্তু পারিপার্শ্বিকতার সমস্ত উপাদানই (উপরে যে ভাবে বর্ণিত হয়েছে) প্রতিটি নির্দিষ্ট প্রযুক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। পারিপার্শ্বিকতা কি নিয়ে গঠিত হবে তা নির্ভর করে বিবেচনাধীন প্রযুক্তির উপর। সুতরাং, সাধারণভাবে, যদিও দুটি পারিপার্শ্বিকতা একই হওয়া

অসম্ভব, তবু কোন বিশেষ প্রযুক্তির জন্য বহু আপাততভাবে দৃশ্যমান ভিন্ন পারিপার্শ্বিকতাকে প্রকৃতপক্ষে সদৃশ ধরে নেয়া যেতে পারে। নিম্নে কিছু দৃষ্টান্ত দেয়া হলো :

- (১) বহুল পরিচিত রাসায়নিক কীটনাশক DDT (Dichloro-Diphenyl-Trichloroethane) প্রাথমিক প্রয়োগের স্থান ও সময়ে ছিল একটি লাগসই প্রযুক্তি। যাহা হোক, কিছু সময় পরে প্রযুক্তিটি এমনকি মূল প্রয়োগের স্থানেও ইনএপ্রোপ্রিয়েট (inappropriate) হয়ে পড়েছে। পরিবেশের ক্ষতিকর প্রভাব ফেলার জন্য এটিকে শিল্পোন্নত দেশগুলোতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে কারণ অবজেক্টিভ ফাংশনে একটি পরিবর্তন ঘটেছে (নেগেটিভ প্রভাব নিম্নকরণের বিষয়ে অধিক গুরুত্ব আরোপের দ্বারা) অপরপক্ষে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে DDT কে এখনো এপ্রোপ্রিয়েট বলে বিবেচনা করা হয় যেহেতু নির্দিষ্ট পারিপার্শ্বিকতা ও অবজেক্টিভ ফাংশনগুলোকে সামগ্রিকভাবে মূল প্রয়োগের স্থান ও সময়ের সাথে সদৃশ বলে বিবেচনা করা হয়।
- (২) সুইজারল্যান্ডে সাধারণ ঘড়ি তৈরি সংক্রান্ত সবচেয়ে লাগসই প্রযুক্তি বেশ দীর্ঘ সময়ের জন্য প্রচলিত ছিল। কিন্তু কোয়ার্টজ ঘড়ির উদ্ভাবনের সাথে সাথে এটি আর লাগসই রইল না, কারণ প্রযুক্তিগত এবং অর্থনৈতিক পারিপার্শ্বিকতার আমূল পরিবর্তন ঘটেছিল। প্রযুক্তিগত সাবস্টিটিউশন (technological substitution) বা প্রতিস্থাপন সাধারণতঃ পুরাতন প্রযুক্তিকে ইনএপ্রোপ্রিয়েট করে তোলে যেহেতু নতুন প্রযুক্তি এসে পারিপার্শ্বিকতার ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করে।
- (৩) বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের জন্য কয়লাভিত্তিক প্রযুক্তি এক সময় খুব এপ্রোপ্রিয়েট ছিল, কিন্তু প্রযুক্তিগত প্রতিস্থাপনের কারণে ইনএপ্রোপ্রিয়েট হয়ে গেল। আবার এখন পারিপার্শ্বিকতার পুনঃ পরিবর্তনের সাথে (বিশেষতঃ সম্পদগত দিকের পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে) কয়লাভিত্তিক প্রযুক্তি আবার এপ্রোপ্রিয়েট হয়ে দাড়িয়েছে। পারিপার্শ্বিকতার পরিবর্তনের কারণে, এককালের ইনএপ্রোপ্রিয়েট হিসেবে চিহ্নিত প্রযুক্তিগুলো ভবিষ্যতে এপ্রোপ্রিয়েট প্রযুক্তিতে পরিণত হতে পারে।
- (৪) কিছু প্রযুক্তি যেমন বৈদ্যুতিক টুথব্রাশ, কেবল কার (cable car), মিন্ক (mink) কোট, আইস-ব্রেকার, জিওথার্মাল শক্তি (geothermal energy) ইত্যাদি স্বল্প কিছু স্থানে এপ্রোপ্রিয়েট এবং অন্যান্য অধিকাংশ স্থানে ইনএপ্রোপ্রিয়েট হিসাবে প্রতীয়মান হয়। এটা হল মূলতঃ পারিপার্শ্বিকতার বিভিন্মতার কারণে।
- (৫) ঔষধ সামগ্রীর সাথে সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি পেনিসিলিন, পোলিও ভ্যাক্সিন, জন্ম নিরোধ বডি ইত্যাদি সারা পৃথিবী জুড়ে এপ্রোপ্রিয়েট কারণ ঐ প্রযুক্তিগুলোর জন্য নির্দিষ্ট পারিপার্শ্বিকতা (যেটা মূলতঃ মানবদেহ সংশ্লিষ্ট) সব স্থানে একই, তাই প্রযুক্তির পারিপার্শ্বিকতা মোটামুটি একই রকম। ঔষধ সামগ্রীর মূল্য এবং ধর্মীয় বিশ্বাস ইত্যাদি কিছু ক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিকতার নিয়ামক হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।
- (৬) মনুষ্যচালিত পরিবহন (সাইকেল বা রিক্সা) শুধুমাত্র ছোট গ্রাম্য আঙ্গিকে এপ্রোপ্রিয়েট বলা যায়, যেখানে যাতায়াতের দূরত্ব স্বল্প। এগুলো উন্নয়নশীল দেশগুলোর অনেক বড় শহরেও ব্যবহৃত এবং দারিদ্রপূর্ণ পারিপার্শ্বিকতায় এপ্রোপ্রিয়েট বলে বিবেচিত হয়। কিন্তু এ প্রযুক্তিগুলো সমৃদ্ধিশালী সমাজে ইনএপ্রোপ্রিয়েট হিসেবে বিবেচিত হয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে একটি প্রযুক্তির এপ্রোপ্রিয়েটনেসের মাত্রা পারিপার্শ্বিকতা ও অবজেক্টিভ ফাংশনস অনুযায়ী সহজেই বর্ণনা করা যায়।

৩.০ লাগসই প্রযুক্তির উপকথা এবং বাস্তবতা (Myths and Realities of Appropriate Technology)

গত দশ বছরে লাগসই প্রযুক্তির উপর প্রকাশনা বৃদ্ধি পেয়েছে প্রচণ্ডভাবে (De Schultze, 1974)। প্রযুক্তির বিভিন্ন পদ্ধতি ও বিভিন্ন রূপের জন্য লাগসই প্রযুক্তি ক্রমান্বয়ে আরো বেশি সাধারণ অভিব্যক্তি (general expression)-এ পরিণত হয়েছে যেখানে প্র্যাকটিশনারগণ উদ্দেশ্যমূলকভাবে উন্নয়নের বিভিন্ন দিক এবং সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তিগত বিকল্পের দিকে লক্ষ্যস্থাপন করে। অত্র প্রবন্ধের এই অংশে, উন্নয়নশীল দেশের প্রেক্ষাপটে লাগসই প্রযুক্তির কিছু সাধারণ বর্ণনা দেয়া হবে যেগুলো এখনো বিবর্তন প্রক্রিয়ার প্রাথমিক ধাপে অবস্থান করছে। এখানে উপস্থাপিত বিশ্লেষণ পূর্বের অংশে আলোচিত এপ্রোপ্রিয়েটনেসের ধারণা সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞান প্রদান করবে।

উন্নয়নশীল দেশের প্রেক্ষাপটে, লাগসই প্রযুক্তি বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষের দ্বারা বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে (Reidijk, 1969)। এই দৃষ্টিকোণগুলোকে চারটি প্রধান আঙ্গিকে সহজেই বিভক্ত করা যায়। - (১) বিকল্প প্রযুক্তি থেকে বাছাইয়ের বিবেচনা; (২) লক্ষ্য জনগোষ্ঠীর (consideration of target group) বিবেচনা; (৩) সম্পদগত সীমাবদ্ধতার বিবেচনা; এবং (৪) বিচ্ছিন্নকারক পরিবর্তনের বিবেচনা (consideration of disruptive changes)। উপরোক্ত বিবেচনাগুলোর এক বা ততোধিক বিষয়ের উপর গুরুত্বের উপর ভিত্তি করে লাগসই প্রযুক্তি বিভিন্ন রকম হয়। এ সম্পর্কে পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলোতে আরো বিশদ ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে।

৩.১ প্রযুক্তি বাছাই আঙ্গিক (Technology Orientation)

এই আঙ্গিকের মূল অন্তর্নিহিত ধারণা হচ্ছে একটি বিশেষ প্রয়োজন চরিতার্থ করার জন্য প্রযুক্তিসমূহের একটি রেঞ্জ বা পরিসর রয়েছে (Sen, 1969)। প্রযুক্তির পরিসর ঐতিহ্যগত (traditional) ও প্রাচীন (primitive) থেকে শুরু করে অত্যাধুনিক (sophisticated) ও আধুনিক (modern) ও পর্যন্ত বিস্তৃত। এই দুই চরম প্রান্তের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তি বিদ্যমান যেগুলো উন্নয়নশীল দেশের জন্য এপ্রোপ্রিয়েট হতে পারে। সুতরাং এটি হচ্ছে “সঠিক বাছাই” এর প্রশ্ন।

শামচার (Schumacher, 1973) ‘ইন্টারমেডিয়েট টেকনোলজী’ (Intermediate Technology) সম্বন্ধে অভিব্যক্তি ব্যবহার করেছেন এই অর্থে যে উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রযুক্তি হওয়া উচিত মূল্যবান আধুনিক শিল্প প্রযুক্তি (industrial technology) এবং দরিদ্রতমদের স্বল্প মূল্যের ক্র্যাফট-ভিত্তিক প্রযুক্তির (craft-based technology) মাঝামাঝি। ইন্টারমেডিয়েট টেকনোলজী এটি নির্দিষ্ট অন্তর্নিহিত অর্থ (connotation) বহন করে যাতে আধুনিকায়ন (sophistication) সহ একটি লেভেল পর্যন্ত প্রযুক্তিগত প্রতিযোগিতামূলক (sophistication) বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকবে যে প্রযুক্তিগত ইনপুট ও পদ্ধতিসমূহ ট্রাডিশনাল অবস্থা থেকে উন্নতর কিন্তু মডার্ন থেকে কম অগ্রগামী। অন্যান্য বিভিন্ন শিরোনাম (যেমন, “ভূগমূল প্রযুক্তি” (grass-root technology)

“নিম্নশ্রেণীর প্রযুক্তি” (bare-foot technology) ইত্যাদি) এ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। উন্নয়নশীল দেশে “ইন্টারমেডিয়েট টেকনোলজী” ব্যবহারের সপক্ষে কিছু যুক্তি নিম্নে উত্থাপন করা হলো :

- (১) এডভান্সড টেকনোলজী যে অবস্থায় উদ্ভাবন হয়েছিল, উন্নয়নশীল দেশগুলোতে তদৃশ অবস্থা বিরাজ করে না। কিন্তু এন্টারমেডিয়েট টেকনোলজীগুলো উন্নয়নশীল দেশগুলোর মত একই রকম অবস্থায় উদ্ভাবন হয়েছিল।
- (২) উন্নয়নশীল দেশগুলোতে মূলধনের স্বল্পতা রয়েছে। সেখানে কিছু বড় ইন্ডাস্ট্রী বা আধুনিক প্ল্যান্টগুলোতে দেশের সকল মূলধনের বড় অংশ বিনিয়োগ হয়ে পুঞ্জীভূত হতে পারে তাতে দেশের অর্থনীতির বাকী অংশ মূলধন থেকে বঞ্চিত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ক্ষুদ্র-পরিসরের শিল্পায়ন ইউনিটগুলোকে দেশের বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেয়া যেতে পারে (রাজধানী বা বড় শহর সংলগ্ন বড় ইন্ডাস্ট্রী বা প্ল্যান্টের পরিবর্তে) এবং এভাবে দেশের বাকী অর্থনীতির সাথে উৎপাদন খাতের সংযোগকে অধিক শক্তিশালী করা যায়।
- (৩) অতীত কার্যক্রমের সাথে মিল না রেখে অকস্মাৎ এক ব্যাপক ব্যবধান তৈরি করা উপদেশযোগ্য নয় বরং বিদ্যমান ভিত্তির উপর কাঠামো তৈরি করে দক্ষতা, জ্ঞান ও কৃৎকৌশলকে আয়ত্ত্ব, উন্নয়ন ও উপযোগী করাই উত্তম। এতে বিকেন্দ্রীকৃত ক্ষুদ্র ক্ষেলের শিল্প-কারখানাগুলোর উৎসাহিত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। তদুপরি এতে ট্রেডিশনাল খাতগুলো স্থানচ্যুত (displaced) বা বিলুপ্ত হওয়ার সুযোগ কম।
- (৪) “কাজ করার মাধ্যমে শেখা” এই মতাদর্শের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে সহজ ও স্বল্প-আধুনিকীকৃত (simple & less-sophisticated) প্রযুক্তিগুলো উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি সুযোগ প্রদান করে। এই মতাদর্শ প্রযুক্তিগত আত্মবিশ্বাসযোগ্যতা (technological self-reliance) গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ব্যাপক ও বিস্তৃত ভিত্তি প্রদান করে।
- (৫) উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় ক্ষুদ্র-ক্ষেত্রের ইন্টারমেডিয়েট টেকনোলজীগুলোর পরবর্তীতে অন্যান্য প্রযুক্তির সাথে সমন্বয় সাধন ও উন্নয়ন (integration & development) গ্রহণ করার সম্ভাবনাই বেশি। অন্যদিকে এডভান্সড প্রযুক্তিগুলোর স্থানচ্যুতকরণ প্রভাব (displacement effects) এর দ্বারা উপরোক্ত পজিটিভ প্রভাব সীমাবদ্ধ হতে পারে।
- (৬) অকার্যকর প্রযুক্তি হস্তান্তর ও লাইসেন্সিং ব্যবস্থার কারণে উন্নয়নশীল দেশে আধুনিক প্ল্যান্টগুলোর দ্বারা অর্জিত বড় লভ্যাংশসমূহ প্রকারান্তরে বৃহত্তর সুবিধা হিসাবে পরিগণিত নাও হতে পারে।

উপরেউল্লিখিত সুবিধাগুলো থাকা সত্ত্বেও গত দুই শতাব্দী ধরে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে আধুনিক ও সর্বাধিক মূলধন-নির্ভর পশ্চিমা প্রযুক্তিগুলোর প্রতি ঝোক বা পক্ষপাতিত্ব দৃষ্টিগোচর হয়। ইন্টারমেডিয়েট টেকনোলজীকে “নিম্নমানের কিছু” (something inferior) টেকনোলজীকে “দ্বিতীয় উত্তম” (second-best) “পুরাতন” (second-hand) প্রযুক্তি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। শামচার এর “ক্ষুদ্রই সুন্দর” ধারণার বিপরীতে “যত বড় তত ভালো” এর সুপ্রচারিত মতের মধ্যে একটি চলমান বিতর্ক আছে (Jequier, 1976)। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে আধুনিক ও বড় পরিসরের প্রযুক্তির (large-scale technology) ব্যবহারের জন্য কিছু যুক্তি নিম্নে উপস্থাপিত হলো :

- (১) এডভান্সড টেকনোলজী হচ্ছে উন্নত দেশগুলোর মূল উৎস; সুতরাং উন্নয়নশীল দেশগুলোকে যত দ্রুত সম্ভব, শিল্পায়নের জন্য এগুলোর ব্যবহার করতে হবে।

- (২) আধুনিক (নতুন) প্রযুক্তিগুলো সাধারণত ইন্টারমেডিয়েট (পুরাতন) প্রযুক্তিগুলোর চেয়ে বেশি উৎপাদনশীল ও অধিক দক্ষ যা প্রযুক্তিগত প্রতিস্থাপনের (technological substitution) ধারণা দ্বারা বোঝানো হয়েছে।
- (৩) যখন ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করা হয়, নতুন উদ্ভাবিত প্রযুক্তি বাতীত অন্য যে কোন পুরানো প্রযুক্তিই অপেক্ষাকৃত দ্রুতভাবে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
- (৪) এডভান্সড টেকনোলজীগুলো সমাজের উপর আধুনিকীকরণের প্রভাব বিস্তার করে এবং শ্রমিক ও ব্যবস্থাপনার গুণগত মান উন্নত করে।
- (৫) পুঁজি-নির্ভর আধুনিক শিল্প-কারখানাগুলো বর্ধিত হারে লাভ করার সুযোগ দেয় যা অন্যদিকে শিল্পের ক্রম-প্রবৃদ্ধি ঘটানোর জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। পুঁজি-নির্ভর শিল্প-কারখানার এ ধরনের বহু পর্যায় বিশিষ্ট প্রভাবে (multiplier effects) পরিণামে সুবিধাজনক হয়।
- (৬) অগ্রসরমান প্রযুক্তি সমগ্র বিশ্বের সাথে সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে সুযোগ এন দেয়। শ্রম বিভাজনের (division of labour) ক্ষেত্রেও সর্বাধিক বিশিষ্টতা এনে দেয়।
- (৭) ক্ষুদ্র ক্ষেত্রের বিকেন্দ্রীকৃত বিনিয়োগ, একটি দেশে প্রতিযোগিতামূলক উদ্ভাবনকারী একটি গোষ্ঠী তৈরিতে ব্যর্থ হতে পারে।
- (৮) অগ্রসরমান প্রযুক্তি বাছাইয়ের অন্যান্য কারণগুলো হলো-
 - যোগাযোগ ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নয়নের দ্রুত ক্রম-বর্ধমান উন্নত ও আধুনিক প্রচার ব্যবস্থা ও প্রদর্শনের প্রভাব;
 - ধনী দেশের মত করে তুলনামূলকভাবে মান সম্মত উৎপাদন ও সরবরাহ পদ্ধতি অর্জনের আকাঙ্ক্ষা;
 - উৎপাদন কাঠামো এমনভাবে করা হয়েছে যা শহর ও রফতানী বাণিজ্যিক বাজারের চাহিদা পূরণ করতে পারে;
 - মূলধন বিনিয়োগে অর্থ পৃষ্ঠপোষকতা (subsidizing capital investment) এবং শ্রম মূল্য বৃদ্ধির অর্থনৈতিক নীতিমালা; এবং
 - প্রযুক্তি আমদানীতে আর্থিক সাহায্য প্রদানকারী বিদেশী সহযোগিতার প্রভাব।

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এডভান্স টেকনোলজী ব্যবহারের উপরেল্লিখিত কারণগুলো ছাড়া কিছু পরিস্থিতিও আছে যেগুলো ইন্টারমেডিয়েট টেকনোলজী ব্যবহারকে কষ্টসাধ্য করে তোলে। সেগুলোর মধ্যে কিছু নিম্নে প্রদত্ত হলো :

- (১) বহু শিল্প-কারখানা রয়েছে যেগুলোকে অর্থনৈতিকভাবে তেমন লাভজনক নয় (বিশেষত ক্ষুদ্র ক্ষেত্রে ও স্বল্প পুঁজির উৎপাদন ইউনিটে), সুতরাং, সেগুলোর উচিত বিস্তৃত বাজারের (যা স্থানীয় বাজারে সীমাবদ্ধ নয়) জন্য উৎপাদন করা। আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতার কারণে প্রয়োজনীয় মাত্রার গুণগত মান নিশ্চিত করার জন্য অবশ্যই আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে।

- (২) ইন্টারমেডিয়েট টেকনোলজী ব্যবহারের ফলে অপারেশন ব্যয় খুব বেড়ে যায় যার কারণে ঘন ঘন ব্যর্থতা ঘটতে থাকে। এছাড়াও খুচরা যন্ত্রাংশে ত্রুটি ও অলভ্যতা মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি করে।
- (৩) বর্তমানে কিছু এডভান্সড প্রযুক্তির ক্ষেত্রে উৎপাদনের পলিসি হিসাবে পণ্যের আকৃতি ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর এবং উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন করছে। প্রতি ফাংশনে তাদের প্রয়োজনীয় ম্যাটেরিয়ালস ও এনার্জীর খরচ হ্রাস পাচ্ছে এবং সার্বিক অবয়ব ক্ষুদ্রতর হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, গত যুগের তুলনায় কম্পিউটার এখন হয়ে গিয়েছে প্রায় ১০ গুণ ক্ষুদ্রতর, ১০০ গুণ সস্তা।

সুতরাং, এডভান্সড, বৃহৎ-স্কেলের ও পুঁজি-নির্ভর প্রযুক্তিগুলো উন্নয়নশীল দেশের জন্য নিশ্চিতভাবে ইনএপ্রোপ্রিয়েট নয় (Disney, 1977)। যাইহোক, এটি সুস্পষ্ট যে, যেখানেই “বিকল্প প্রযুক্তি” বিদ্যমান, উন্নয়নশীল দেশগুলোর তিনটি বিষয়ে খেয়াল রেখে প্রযুক্তি বাছাই করা প্রয়োজন। এগুলো হচ্ছে নিয়ামকগুলোর অনুপাত (factor proportion), উন্নয়নের স্তর এবং উন্নয়ন কৌশল। এগুলোর সাথে প্রযুক্তিটি এপ্রোপ্রিয়েট হতে হবে।

৪.০ লক্ষ্য জনগোষ্ঠী আঙ্গিক (Target Group Orientation)

সাথে লাগসই প্রযুক্তির আরেকটি সাধারণ ভিত্তি হচ্ছে নির্দিষ্ট লক্ষ্য জনগোষ্ঠী (target group) এর মৌলিক চাহিদাগুলো মিটানো (De Shulter, 1980)। দরিদ্র জনগোষ্ঠী হচ্ছে মূল লক্ষ্য। সুতরাং লাগসই প্রযুক্তি প্রাম ও বস্তিবাসী দরিদ্র মানুষদের মৌলিক চাহিদা মিটাবার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত থাকতে হবে। জনগোষ্ঠীকে তাদেও নিজেদের ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল করে তোলার জন্য এই পদক্ষেপ দেয়া প্রয়োজন। ব্যবস্থাপত্র হচ্ছে গ্রামভিত্তিক ক্ষুদ্র স্কেলের প্রযুক্তির ব্যবহার এবং তার সাথে উপর্যুপরি প্রয়োজনীয়তা এই যে, প্রযুক্তিটি গ্রাম্য মানুষের কাজকে সহজতর করবে এবং তাদের হাড়-ভাঙ্গা দৈহিক খাটুনি থেকে তাদেরকে মুক্ত করবে। উপরন্তু, লাগসই প্রযুক্তি অবশ্যই মহিলাদের উদ্যোগে ও শ্রমকে অধিক লাভজনক করে তোলার ব্যাপারে সাহায্য করবে।

ক্ষুদ্র স্কেলের শিল্প-কারখানাগুলোর পক্ষে সম্ভাবনা বেশী হচ্ছে কৃষি ও অন্যান্য ফিডার শিল্প-কারখানার সাথে লিংকেজ তৈরী করা। উদ্দেশ্য হচ্ছে ঐতিহ্যবাহী খাতগুলোকে (traditional sector) স্থানচ্যুত না করে বরং উজ্জীবিত করা যেগুলোতে গ্রামের অধিকাংশ মানুষ কাজ করে এবং জাতির দরিদ্র জনগোষ্ঠী অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখে (Herdt et al, 1977)। বিভিন্ন ধরনের আয়ের ব্যাপক বিস্তার লাভ করলে অন্যান্য শিল্প-কারখানায় বাজারজাতযোগ্য পণ্যের চাহিদা সৃষ্টি করবে। এটা এমন একটা ডিমান্ড ফ্যাক্টর যা বৃহৎ জনগোষ্ঠীর জন্য পণ্য ও সেবা উৎপাদনের ক্ষেত্রে উন্নয়ন প্রাক্রমকে উদ্দীপিত করবে। এতে বৃহৎ স্কেলের শিল্প-কারখানার মত শহর এলকার কিছু অভিজাতদের জন্যই নয় বরং সমগ্র জনগোষ্ঠীর জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে।

৫.০ সম্পদগত সীমাবদ্ধতা আঙ্গিক (Resource Constraint Orientation)

লাগসই প্রযুক্তির তৃতীয় ভিত্তি হচ্ছে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সঙ্গতিপূর্ণ প্রযুক্তি (matching technology) ও সেইসাথে সম্পদগত বৈশিষ্ট্য (resource endowment) এর বিবেচনা (Tetieli, 1978) উন্নয়নশীল দেশগুলোর সাধারণ অবস্থা অনুযায়ী বিভিন্ন মানদণ্ড (criteria) তৈরি

হয়েছে। এগুলোর মধ্যে আছে বাছাইকৃত প্রযুক্তিতে শ্রমের আধিক্য (labour intensity), স্বল্প পুঁজির প্রয়োজনীয়তা, নিম্নমানের দক্ষতার ব্যবহার এবং স্বল্পতর এনার্জীর খরচ। এখানে আবারো দেখা গেছে যে, আধুনিক বৃহৎ স্কেলের প্রযুক্তিগুলো সাধারণতঃ বিপরীত বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে। তাই ইন্টারমেডিয়েট টেকনোলজী ব্যবহার করার জন্য পরামর্শ দেয়া যেতে পারে। ক্ষুদ্র-স্কেলের ইন্টারমেডিয়েট টেকনোলজী ব্যবহারের সুবিধাগুলো হচ্ছে :

- ক্ষুদ্র-স্কেলের উৎপাদন ইউনিটগুলো কষ্টার্জিত মূলধন সঞ্চয়ের সুযোগ প্রদান করে। ফলে বিদ্যমান প্রধান সম্পদগুলোকে (capital resources) সমগ্র অর্থনীতি জুড়ে আরো ব্যাপকভাবে বিস্তৃত করার সুযোগ করে দেয়।
- ক্ষুদ্র স্কেলের উৎপাদন ইউনিটগুলো স্থানীয়ভাবে বিদ্যমান কাঁচামালের সদ্যবহার করে এবং এভাবে বিদেশী আমদানীর উপর জাতীর নির্ভরশীলতা হ্রাস করে।
- ক্ষুদ্র স্কেলের উৎপাদন ইউনিটগুলো এনার্জী সাশ্রয়কারী হওয়ার সম্ভাবনা অধিক যেহেতু এই শিল্পগুলোতে উৎপাদন এবং/অথবা বন্টনে স্বল্প এনার্জীর প্রয়োজন হয়।

অপরপক্ষে, ইন্টারমেডিয়েট টেকনোলজীতে বহুবিধ অসুবিধাও রয়েছে তাদের মধ্যে কিছু নিম্নে উল্লেখ করা হল :

- ◆ অধিক হারে কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং কাজের সুযোগ প্রদান যা উৎপাদনশীলতাকে নিম্নমুখী ও অদক্ষতাকে চিরস্থায়ী করে তুলতে পারে।
- ◆ শ্রম-নির্ভর উৎপাদন পদ্ধতিগুলো একটি নির্দিষ্ট পণ্য তৈরিতে অপেক্ষাকৃত বেশি সময় লাগায় এবং তাতে পুঁজি-নির্ভর উৎপাদনের তুলনায় ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল অধিক সময় ধরে আটকে থাকে।
- ◆ সস্তা শ্রম সবসময় উচ্চ মূল্যের মত 'মান সম্পন্ন কাজ' প্রদান করে না। সুতরাং শ্রম-নির্ভর উৎপাদন পুঁজি-নির্ভর উৎপাদনের চেয়ে বেশি ব্যয় বহুল হতে পারে।
- ◆ শ্রম-নির্ভর শিল্প-কারখানাগুলোতে অপেক্ষাকৃত বেশি জটিল ব্যবস্থাপনা দক্ষতার প্রয়োজন হয়, উন্নয়নশীল দেশগুলোতে যেটির স্বল্পতা আছে।

সুতরাং, ইন্টারমেডিয়েট টেকনোলজী যা বিদ্যমান কর্মসংস্থানকে সংরক্ষণ করে এবং নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে, সেগুলো বহু ক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবে এপ্রোপ্রিয়েট নাও হতে পারে। কর্মসংস্থানের ধরন উন্নয়নের সাথে পরিবর্তিত হয় এবং হওয়া উচিত যেমনভাবে উন্নত দেশগুলোতে ঘটেছে।

৬.০ বিচ্ছিন্নকারক পরিবর্তন আঙ্গিক (Disruptive Change Orientation)

লাগসাই প্রযুক্তির চতুর্থ ভিত্তি হচ্ছে প্রযুক্তিগত অগ্রসরতা অর্জনের আকাংখা যা হবে “বিপ্লব” নয় বরং “বিবর্তন” এর মধ্য দিয়ে (Nwosu, 1975) এই ধারণাকে ব্যাখ্যা করতে ব্যবহৃত সবচেয়ে প্রচলিত কিছু শব্দ হচ্ছে “নন-ভায়োলেন্ট”, “অদৃশ্যীয়” অথবা “সফট প্রযুক্তি” (soft technology), “মনুষ্য মুখ সম্বলিত প্রযুক্তি” বা “প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ” এবং “দেশজ” (indigenous), অথবা “স্ব-সহায়” (self-help), প্রযুক্তি যেগুলো দিতে পারে “শান্তি এবং স্থায়ীত্ব”। এগুলো ঐ প্রযুক্তি যেগুলো ঐতিহ্যবাহী ইনপুট (traditional input) ও প্র্যাকটিস

থেকে দূরে অবস্থান করে না। ক্ষুদ্র ক্ষেত্র, শ্রম-নির্ভর, গ্রাম্য প্রয়োজনভিত্তিক এবং স্বল্প সম্পদ দ্বারা পরিচালিত হওয়া ছাড়াও লাগসই প্রযুক্তির নিম্নোক্ত গুণাগুণ থাকা দরকার।

- স্থানীয় সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া;
- পরিবেশ বা ইকোলজিক্যাল চক্র (ecological cycle) কে রক্ষা করা; এবং
- স্থানীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতি (local decision making process) এর সাথে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া।

লাগসই প্রযুক্তি দর্শনের চারটি মৌলিক আঙ্গিক সম্পর্কে উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে, লাগসই প্রযুক্তি কেন বিভিন্ন মানুষের কাছে ভিন্ন অর্থ বহন করে। এর কারণ তারা বিভিন্ন আঙ্গিকের মধ্যে বিভিন্ন আপেক্ষিক অগ্রাধিকার (relative priorities) সূচিত করে এবং এমন কোন প্রযুক্তি নেই যা একাধারে সমস্ত শর্ত (criteria) পূরণ করতে পারে। এই মানদণ্ডের প্রশ্নটি পরবর্তী অংশে আলোচিত হলো।

৭.০ প্রযুক্তিগত এপ্রোপ্রিয়েটনেস বা উপযুক্ততা নির্ণয় (Determining Technological Appropriateness)।

বিভিন্ন প্রকাশনায় লাগসই প্রযুক্তি বাছাইয়ের শর্তবলী (criteria) ব্যাপকভাবে বিস্তৃত। একটি নমুনা তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হল (Brownder, 1979; De Schultze, 1980; Nwosu, 1975) :

- (১) লাগসই প্রযুক্তির প্রাথমিক লক্ষ্য হচ্ছে গ্রাম্য জনগোষ্ঠীর মৌলিক চাহিদা মেটানো।
- (২) লাগসই প্রযুক্তির বিপুল সংখ্যক শ্রমিকের কর্মসংস্থানের (মহিলা শ্রমিকসহ) নিয়োগের সক্ষমতা থাকতে হবে।
- (৩) লাগসই প্রযুক্তিকে বিদ্যমান ঐতিহ্যহত (traditional) কর্ম সংরক্ষণ ও নতুন কর্ম সৃষ্টি করতে হবে।
- (৪) লাগসই প্রযুক্তিকে হতে হবে স্বল্প মূল্যের এবং যেখানে প্রয়োজন হবে নিম্ন স্তরের দক্ষতা।
- (৫) লাগসই প্রযুক্তিকে ক্ষুদ্র ক্ষেত্রের উৎপাদন পরিচালনার জন্য উযুক্ত পদ্ধতি প্রদান করতে হবে।
- (৬) লাগসই প্রযুক্তির স্বল্পতর পরিমাণ এনার্জি ও অন্যান্য অনবায়নযোগ্য সম্পদ (non-renewable resources) ব্যবহারে সুবিধা থাকতে হবে।
- (৭) লাগসই প্রযুক্তিকে দেশজ কঁচামাল এবং সেবার সুবিধাদি ব্যবহারে সক্ষম হতে হবে।
- (৮) লাগসই প্রযুক্তিকে বর্জ্য পুনর্ব্যবহারকারী (waste-recycling) এবং অদূষণকারী (non-polluting) হতে হবে।
- (৯) লাগসই প্রযুক্তিকে জনসাধারণের জন্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিমূলক পদ্ধতি (economic growth process) গ্রহণ করতে হবে।
- (১০) লাগসই প্রযুক্তিকে হতে হবে বিকেন্দ্রীকৃত এবং রোজগারের অসমতা (income disparity) লাঘবে সক্ষম।
- (১১) লাগসই প্রযুক্তিকে স্থানীয় সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে

(১২) লাগসই প্রযুক্তিকে সমাজ ব্যবস্থার সাথে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

(১৩) লাগসই প্রযুক্তিকে বিদ্যমান রাজনৈতিক পদ্ধতির নিকট গ্রহণযোগ্য হতে হবে।

এমনকি উপর্যুক্ত আংশিক তালিকাও এটি চিহ্নিত করার জন্য যথেষ্ট যে লাগসই প্রযুক্তি শিরোনামে আমরা একটি সর্ব আরোগ্যকারী উপায়ের সন্ধান করছি যা বাস্তব জগতে বিরাজ করে না। তথাকথিত ইন্টারমেডিয়েট টেকনোলজী, শ্রম-নির্ভর প্রযুক্তি এবং তৃণমূল প্রযুক্তি দ্বারা সন্ধানকৃত আংশিক সমাধানগুলোও সফল হয়নি। ব্যর্থতার বহুবিধ কারণ সনাক্ত করা যায় যেমন :

(১) ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব (Lack of Comprehensive Approach)

কর্মসংস্থান সৃষ্টির দিকটিকে ব্যাপকভাবে অতিরঞ্জিত করা হয়েছে। ঐতিহ্যবাহী পেশাগত ধরনগুলোর (traditional occupational pattern) রক্ষণাবেক্ষণের উপর অতিরিক্ত জোর দেয়া হয়েছে। কিছু দৃষ্টিভঙ্গীকে বিচ্ছিন্নভাবে গণ্য করা হয়েছে (Bownder, 1979)।

(২) প্রতিযোগিতামূলক বিবেচনার অভাব (Lack of Competitive Consideration)

বাণিজ্যিক আকর্ষণীয়তার জন্য প্রয়োজনীয় গুণগত মান, উৎপাদনশীলতা ও কর্মদক্ষতার উপর খুব সামান্য বিবেচনা করা হয়েছে। ক্ষুদ্র স্কেলের দোহাই দিয়ে লাভের ব্যাপারটি উপেক্ষিত হয়েছে। এটি শুধুমাত্র একটি অন্তর্মুখী পরিচালিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (inward directed economic system) (Nwosu, 1975)।

(৩) ভবিষ্যতের জন্য প্রয়োজনীয় দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব (Lack of Future Orientation)

পুরানো সুদিন ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় বর্তমান সমস্যার আশু সমাধানের জন্য সকল শক্তি প্রয়োগ করা হচ্ছে। ভবিষ্যৎধর্মী সমস্যার সমাধানের দিকে খুবই সামান্য খেয়াল করা হচ্ছে অথবা বিবেচনা নেই বললেই চলে (Jequier, 1976)।

(৪) ব্যর্থ আশা সৃষ্টি (Creating False Hope)

বর্তমানে প্রচুর সংখ্যক উন্নয়নমূলক সমস্যা প্রতিটি দেশেই বিরাজমান। এ সমস্ত সমস্যা সমাধানে ক্ষুদ্র স্কেলের প্রযুক্তির ক্ষমতা অপ্রতুল। এ বাস্তবতা অনুধাবনে ব্যর্থতা সর্বদাই দেখা গিয়েছে (De Shulter, 1980)।

(৫) অপর্যাপ্ত পরিবর্তনের হার (Inadequate Rate of Change)

জনসংখ্যা ও তার সাথে উচ্চুভিলাষ (aspiration) দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। সে তুলনায় গ্রামভিত্তিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে জাতীয় উন্নয়ন সাধন বলতে গেলে একটি খুবই শ্লথ প্রক্রিয়া বা দুরূহ বলা চলে (Reidijk, 1969)।

(৬) প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং প্রযুক্তি উন্নয়নের মধ্যে একটি কৃত্রিম সীমারেখা তৈরি করা হয়েছে। সুসঙ্গত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ কৌশল অর্জনের চেষ্টা খুব সামান্যই হয়েছে (Nwosu, 1975)।

(৭) প্রতিষ্ঠানগত অবকাঠামোর অভাব (Lack of Institutional Infrastructure)

লাগসই প্রযুক্তির হস্তান্তর এবং উন্নয়নের জন্য প্রতিষ্ঠানগত প্রতিবন্ধকতাকে ব্যাপকভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে। প্রযুক্তি উদ্ভাবনের আবহাওয়া তৈরিতে সামান্যই উদ্যোগ নেয়া হয়েছে (Maruyama, 1974)।

(৮) বিকল্প প্রযুক্তি সংক্রান্ত তথ্য প্রবাহের অভাব (Lack of information Flow on Alternative Technology) ।

বিভিন্ন দেশে উদ্ভাবিত নানা প্রকার প্রযুক্তি সংক্রান্ত তথ্যদির অভাবে উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে কারিগরী সহযোগিতা খুব একটা সফল হয়নি। সাফল্যের তুলনায় ব্যর্থতার প্রচারণা বেশি হয় (Darrow, 1981) ।

(৯) সমস্যাকে নয় বরং টুলস এর উপর বেশি গুরুত্বারোপ (Emphasizing Tool and not the Problem)

প্রযুক্তি বাছাইকরণ পদ্ধতি, সমস্যার কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিককে উপেক্ষা করে। যেমস, শক্তিশালী প্রদর্শন দ্বারা সৃষ্ট আধুনিকতার ইমেজ আসে কিন্তু মূল সমস্যার গভীর বিষয় অনেক সময় উপেক্ষা করা হয়ে থাকে (Jequier, 1976) ।

(১০) জনসাধারণের অংশগ্রহণের অভাব (Lack of Peoples' Participation) ।

প্রতিটি লাগসই প্রযুক্তির প্রকল্প শুরু এবং বাস্তবায়িত হওয়া উচিত যাদের প্রয়োজন তাদের দ্বারা। কোনটি যথার্থ বা উপযুক্ত তা জনসাধারণদের নিজেদের দিয়েই শুধুমাত্র নির্ণয় করা যায়। এটি তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া যায় না।

উপরের আলোচনা থেকে এটি সুস্পষ্ট যে, প্রযুক্তিগত এপ্রোপ্রিয়েটনেস বা উপযুক্ততা নির্ণয়ের মৌলিক সমস্যা হচ্ছে একটি সুসঙ্গত ধারণামূলক কাঠামোর অভাব। ধারণামূলক কাঠামো সম্পর্কে পূর্বে ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রযুক্তিগত উপযুক্ততা বা এপ্রোপ্রিয়েটনেস কোন প্রযুক্তির অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য নয়, এটি ঐ পারিপার্শ্বিকতা থেকে উদ্ভূত যেখানে এটা ব্যবহৃত হবে। এবং যে সমস্ত জনগণ প্রযুক্তিটি ব্যবহার করবে তারা নিজেরাই এপ্রোপ্রিয়েটনেস বা উপযুক্ততা নির্ধারণ করবে (অনুকূল বা পজিটিভ প্রভাব সর্বোচ্চ বৃদ্ধিকরণ ও প্রতিকূল বা নেগেটিভ প্রভাব সর্বনিম্নকরণ ও তাদের সমন্বয় সাধনের দ্বারা এবং বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্যে)। উপরন্তু, পারিপার্শ্বিকতা বিবেচনা করতে হবে সামগ্রিকভাবে।

৮.০ লাগসই প্রযুক্তিকে কিভাবে সফল করা যায় (How to Make Appropriate Technology Work)

লাগসই প্রযুক্তিকে সফল করার পূর্বশর্ত হচ্ছে লাগসই প্রযুক্তি সম্পর্কিত ভ্রান্ত ধারণাগুলোকে দূর করা। এটি করা যায় ধারণামূলক কাঠামো বিশদভাবে অনুধাবনের মাধ্যমে; এজন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অনুধাবন করা প্রয়োজন—

- (১) লাগসই প্রযুক্তির প্রচলিত দৃষ্টান্ত যেমন, সৌরচুল্লী, বাঁশনির্মিত বায়ুকল, বায়োগ্যাস জেনারেটর, মোটরবিহীন পরিবহন, ফেরোসিমেন্ট নৌকা সব উন্নয়নশীল দেশের জন্য নিশ্চিতভাবে এপ্রোপ্রিয়েট নয়।
- (২) অগ্রসরমান প্রযুক্তি যেমন, কম্পিউটার, মাইক্রো-ইলেক্ট্রনিক্স, বায়ো-ইঞ্জিনিয়ারিং, রিমোট সেন্সিং ইত্যাদি সব উন্নয়নশীল দেশের জন্য নিশ্চিতভাবে ইনএপ্রোপ্রিয়েট নয়।

(৩) কোনটি এপ্রোপ্রিয়েট কিংবা কোনটি ইনএপ্রোপ্রিয়েট তা নির্ধারণ ক্রমাগতভাবে করতে হবে এবং প্রযুক্তির উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন একটি ভারসাম্যপূর্ণ কৌশল।

প্রযুক্তির উন্নয়ন দুইভাবে করা যায়, প্রথমতঃ বিদেশী প্রযুক্তিকে নিজের দেশের উপযোগী করে প্রযুক্তি আত্মস্থকরণ করা যায় (আধুনিক ও ইন্টারমেডিয়েট উভয়ই, যেগুলো অন্য কোথাও এপ্রোপ্রিয়েট)। দ্বিতীয়তঃ দেশজ প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে (বৃহৎ ও ক্ষুদ্র উভয় স্কেলের)। প্রথম ক্ষেত্রে প্রযুক্তি হস্তান্তর করা হয় এবং উপযোগীকরণের মাধ্যমে এপ্রোপ্রিয়েট করা হয়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, নিজস্ব প্রয়োজন ও ডিজাইন অনুযায়ী একটি প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে এপ্রোপ্রিয়েট করা যায়। তবে যেহেতু আধুনিক ও ইন্টারমেডিয়েট প্রযুক্তির সুবিধা এবং অসুবিধা দুটিই আছে, এটি সুস্পষ্ট যে “উচ্চ” (আধুনিক, বৃহৎ স্কেলের ইত্যাদি) অথবা “নিম্ন” (মধ্যবর্তী, ক্ষুদ্র স্কেলের ইত্যাদি) প্রযুক্তির কোনটাই বিচ্ছিন্নভাবে উন্নয়নশীল দেশগুলোর কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করতে পারে না। যা প্রয়োজনীয় তা হচ্ছে উচ্চ ও নিম্ন উভয় প্রকার প্রযুক্তির মধ্যে যেগুলো এপ্রোপ্রিয়েট, সেগুলো বাছাই ও প্রয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং এর জন্য প্রয়োজন একটি সমন্বয়কৃত কৌশল।

উন্নয়নশীল দেশের প্রযুক্তি বাছাইয়ের অবস্থাকে তিনটি বৃহৎ খাতে বিভক্ত করা যায়।

- নেতৃত্বদানকারী খাত (Leading Sector) : যা নিশ্চিতভাবে ভবিষ্যতে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের জন্য;
- চালনাকারী খাত (Driving Sector) : যা ভবিষ্যতে প্রযুক্তিগত ব্যবধান হ্রাস করবে বলে আশা করা যায়; এবং
- উদীয়মান খাত (Evolving Sector) : যা নিকট ভবিষ্যতের গ্রাম্য চাহিদা মেটানোর চেষ্টা করে।

এই তিনটি খাতের জন্য লাগসই প্রযুক্তি বাছাইকরণের জন্য প্রতিটি উন্নয়নশীল দেশের প্রয়োজন একগুচ্ছ কৌশলমালা। টেবিল নং ১-এ লাগসই প্রযুক্তি বাছাইয়ের একটি খাতভিত্তিক মডেল দেয়া হলো।

লাগসই প্রযুক্তি বাছাইকরণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে প্রযুক্তি সম্পর্কিত তথ্য (বিকল্প প্রযুক্তিসহ), প্রযুক্তিগত পূর্বাভাস (technological forecasting) ও প্রযুক্তি মূল্যায়ন (technology assessment)। প্রযুক্তি মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায়, শর্তমূলক কার্যাবলীকে (criteria function) জাতীয় লক্ষ্য (national goals) অনুযায়ী সমঞ্জস্যপূর্ণ করা হয়। উপরন্তু, প্রতিটি প্রযুক্তির মূল্যায়ন হবে সামগ্রিক পারিপার্শ্বিকতার পরিপ্রেক্ষিতে। প্রযুক্তি বাছাই সম্পন্ন হওয়ার পর পর্যাপ্ত প্রযুক্তিগত অবকাঠামো প্রদান প্রয়োজন হবে যা লাগসই প্রযুক্তির অবলম্বন (adoption), উপযোগীকরণ (adaption), উদ্ভাবন, উন্নয়ন এবং বাজারজাতকরণের জন্য অপরিহার্য।

টেবিল - ১ : একটি খাতভিত্তিক মডেল : এপ্রোপ্রিয়েট টেকনোলজী বাছাই এর কৌশল

খাত	উদ্দেশ্য	এপ্রোপ্রিয়েটনেসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্তাবলী (adoption)	পদ্ধতিগত প্রয়োজনীয়তা
নেতৃত্বদানকারী (Leading)	প্রযুক্তি রপ্তানীর মাধ্যমে পুঁজি গঠনের জন্য কিছু বাছাইকৃত খাতে বিশ্বের প্রথম সারির প্রযুক্তি অর্জন	আন্তর্জাতিক বাজারে লভ্যাংশে সর্বাধিকীকরণ	প্রযুক্তিগত পূর্বাভাস (forecasting) প্রযুক্তি মূল্যায়ন (assessment), গবেষণা, উন্নয়ন ও বাজারজাতকরণ
চালনাকারী (Driving)	প্রযুক্তি আমদানীর মাধ্যমে সুদক্ষতা ও উৎপাদনশীলতার জন্য কিছু বাছাইকৃত খাতে প্রযুক্তিগত আধুনিকতা অর্জন।	লভ্যাংশ সর্বাধিকীকরণ এবং ক্ষতি সর্বনিম্নকরণ	প্রযুক্তি হস্তান্তর, প্রযুক্তি মূল্যায়ন প্রযুক্তি উপযোগীকরণ (adaptation)
উদীয়মান (Evolving)	দেশজ প্রযুক্তির মাধ্যমে গ্রামবাসীদের মৌলিক চাহিদা মেটানোর জন্য কিছু বাছাইকৃত খাতে প্রযুক্তিগত আপগ্রেডেশন অর্জন।	স্থানীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যে বিচ্ছিন্নকারী পরিবর্তন (disruptive change) হ্রাসকরণ	প্রযুক্তিগত তথ্য, প্রযুক্তি মূল্যায়ন, অবলম্বন (adoption), উপযোগীকরণ (adaptation) ও উদ্ভাবন (innovation)

৯.০ উপসংহার

বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তি যেমন এডভান্সড টেকনোলজী থেকে শুরু করে ইন্টারমেডিয়েট টেকনোলজী ও নিম্ন পর্যায়ের প্রযুক্তিও এখানে বিভিন্ন আঙ্গিকে রয়েছে। দেশের সামাজিক পারিপার্শ্বিকতা অনুযায়ী প্রতিটি প্রযুক্তিকে পূর্বের বর্ণনানুযায়ী সংজ্ঞায়িত করা যায় এবং নির্ধারণ করা যায় প্রযুক্তিটি এপ্রোপ্রিয়েট কি না। দেখা যাবে, এডভান্স, ইন্টারমেডিয়েট ও নিম্ন পর্যায়ের প্রযুক্তির সকল স্তরে এপ্রোপ্রিয়েট এবং ইনএপ্রোপ্রিয়েট উভয় টেকনোলজী রয়েছে। দেশের জন্য ইনএপ্রোপ্রিয়েট টেকনোলজী বিভিন্নভাবে বিভিন্ন কালে বর্তমান থেকে ভবিষ্যৎ পর্যন্ত যে কোন সময়ে নেগেটিভ ফ্যাক্টর বা প্রভাব বিস্তার করতে পারে এবং তাতে বহুবিধ সমস্যার উদ্ভব ঘটতে পারে। যেন সামাজিক ভারসাম্যহীনতা, পরিবেশ বান্ধবহীনতা ইত্যাদিসহ অন্যান্য বিভিন্ন প্রকার সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। তাই দেশের জন্য সামাজিক পারিপার্শ্বিকতা অনুযায়ী এপ্রোপ্রিয়েট টেকনোলজীর সন্ধান করতে হবে এবং তা বিদ্যমান সামাজিক পরিবেশে ব্যবহার করতে হবে। একদিকে এপ্রোপ্রিয়েট টেকনোলজী দেশজ অবকাঠামো ব্যবহারের মাধ্যমে উদ্ভাবন করতে হবে। এবং অপরদিকে প্রযুক্তিটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাসটেইনেবল (sustainable) করার জন্য দেশজ কাঁচামাল, লোকবল ও সম্পদ ব্যবহারের দিকে বিশেষ খেয়াল করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ প্রযুক্তি অন্য স্থান থেকে আনয়ন করে দেশজ প্রযুক্তি (indigenous technology) হিসাবে রূপান্তরিত করা

যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে রিক্তা জাপান থেকে আনার পর অচিরেই তা এ দেশের নিজস্ব প্রযুক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে। প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে আনিত প্রযুক্তি রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং (Reverse Engineering) এর মাধ্যমে উপযোগী (adaptation) করেও এপ্রোপ্রিয়েট করা যায়।

তথ্য নির্দেশিকা

- Bownder, B. (1979); Appropriate technology for Developing countries: Some Issues, *Technological Forecasting and Social Change*, Vol. 15.
- Brown, R.H. (1978); Appropriate Technology and the Grass Root, *Development Economics*, Vol. 15
- Darrow, K. et al, (1981); *Appropriate Technology Sourcebook*, New York; Volunteers in Asia.
- De Schulter, J. and Bemer, G. (Eds.) (1980); Fundamental Aspects of Appropriate Technology, Delft University Press, Delft.
- Dickson, D. (1974); *Alternative Technology and the Politics of Technological Change*, London; Fontana.
- Disney, R. (1977); Economics of Gobar-Gas Versus : a Critique of Intermediat Technology, *Development and Change*, Vol.8.
- Herd, R.W. and Barker, R. (1977), Small Farmers and Changing Rice Technology, *EKI*, Vol.25.
- Jequier, N. (ED.) (1976): *Appropriate Technology: Problems and Promise*, Paris: OECD Development Centre.
- Marshen. K. (1970) Progressive Technologies for Developing Countries, *International Labour Review*, Vol. 101.
- Maruyama, M. (1974) Endogeneous Research Versus Experts from Outsides, *Futures* Vol.6.
- Nwosu, B.J. (1975); Some Problems of Appropriate Technology Transfer, *Development Economics*, Vol. 13.
- Reidijk, W. (Ed.) (1969), *Appropriate Technology for Developing Countries*, Delft University Press, Delft.
- Sharif, M.N. (1983), Management of Technology Transfer and Development, UNESCAP, Regional Centre for Technology Transfer, Bangalore, India.
- Schumacher, E.F. (1973), *Small is Beautiful*, London: Abacus.
- Sen, A.K. (1969), *Chice of Technology: A critical Survey of a Class of Debates*, Un Industrial Planning and Programming Seres No. 3, New York.
- Tetiel, S. (1978), On the Concet of Appropriate Technology for Less Industrialized Countries, *Technological Forecasting and Social Change*, Vol .11.